ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪৩, ১৪৩২/২০২৫, ১৪১-১৬০
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4308

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি সৃষ্টিতে চিত্রশিল্পীদের প্রত্যক্ষ আন্দোলন-সংগ্রাম : একটি পর্যালোচনা

ড. আহম্মেদ শরীফ
সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: When attempting to reconstruct the history of Pakistan, it becomes evident that researchers have, in most cases, focused primarily on the political background in their historical investigations. But the Liberation War of Bangladesh was not only a political and military movement but also a cultural awakening, where visual artists played a significant role. During the Pakistan peroid, artists in East Pakistan (now Bangladesh) actively contributed to the development of national consciousness through their art. They depicted the oppression, disparity, and injustices faced by Bengalis under the Pakistani regime, using powerful visual narratives that sparked public awareness and resistance. Prominent artists such as Quamrul Hassan, Safiuddin Ahmed, Hashem Khan and Mohammad Kibria portrayed rural life, common people, and the struggle for justice in their artwork. These creations served as cultural resistance and inspired patriotism among the masses. Especially notable were their contributions during the 1969 mass uprising and the 1971 Liberation War, including revolutionary posters, makeshift workshops at the Faculty of Fine Arts. This paper reviews the direct involvement of visual artists in shaping the socio-political context leading up to the Liberation War. It evaluates the impact of their artworks in mobilizing public opinion and fostering a spirit of resistance and national identity. It argues that art served not just as a mirror of reality, but as a powerful tool for protest, motivation, and liberation.

Key Words: Liberation War, Painter Artist, National Consciousness, Cultural Movement, Resistance, Fine Art, Institute of Fine Arts, Swadhin Bangla Betar Kendra, Poster Art, Mass Awakening, Political Protest.

ভূমিকা

বিভাগোত্তরকালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শিল্পকলাতে সামন্তবাদী ও ধর্মীয় জীবনভাবনার প্রাধান্য ছিল। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কারণে তখন এ অঞ্চলের মানুষ প্রথম ধর্মীয় পরিচয়ের তুলনায় বাঙালিত্বের পরিচয়কে বড়

হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেছিল। জনসাধারণের মধ্যে জেগে ওঠা সেই নতুন চেতনা মানবতাবাদী, দেশপ্রেমিক ও সমাজ-সচেতন শিল্পীদের মধ্যেও সহজেই সঞ্চারিত হয়েছিল।[১] এ সময় বাঙালিরা নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও শিল্পের দিকে দৃষ্টি দেয় এবং সেগুলো মাধ্যমে আত্মসঞ্জীবনীর চেষ্টা করে।[২] বাঙালি জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজের ধর্মীয় কুসংস্কার, রক্ষণশীলতা এবং ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির বন্ধন ছিন্ন করে গড়ে তোলে একটি নতুন অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক বাঙালি সংস্কৃতি। নানা বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে শিল্প-সংস্কৃতির এ নিজস্বতা গড়ে তোলা হয়েছে।[৩]

বাঙালিত্ব ও পাকিস্তানিবাদের মধ্যে এ আদর্শিক দ্বন্দ্ব মূলত দার্শনিক। একদিকে সমান্তবাদী রাষ্ট্রের স্বার্থ ও দর্শন জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা; অন্যদিকে শিল্পী ও সাহিত্যিকরা সমাজের কাছে দায়বদ্ধতা থেকে এই চাপিয়ে দেওয়া দর্শনের বিপরীতে নিজেদের অবস্থান জানান দেন এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সামন্তবাদী শক্তি পাকিস্তানি শাসকগণ সাম্প্রদায়িকতা ব্যবহার করে বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে অন্যদিকে বাঙালি সাম্প্রদায়িকতা থেকে বেরিয়ে এসে মানবতার পক্ষে অবস্থান নিচ্ছে। এই পারস্পরিক আদর্শের দ্বন্দ্ব একসময় বাঙালির মধ্যে এই বোধ আসে স্বাধীন দেশ গঠন করা ছাড়া তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এই লড়াইয়ে শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি আলোচনা করতে গেলে আমরা শুধু রাজনৈতিক পটভূমিই আলোচনা করি। শুধু কি রাজনীতিবিদগণ দেশের মুক্তির জন্য কাজ করেছিলেন? তৎকালীন পূর্ব বাংলার আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির প্রেক্ষাপট তৈরিতে পেশাজীবী অন্যান্যদের সাথে কি চিত্রশিল্পীদের কোনো ভূমিকা ছিল? বর্তমান প্রবন্ধে অনুসন্ধান করে দেখানো হয়েছে কীভাবে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে চিত্রশিল্পীরা শিল্পকর্মের পাশাপাশি বাংলাদেশের রাজনীতিকে আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে গতিশীল করে এবং স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রেক্ষাপট তৈরি করে।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা পদ্ধতির মৌলিক উদ্দেশ্য হলো গবেষণার বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণ করা। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক গবেষণা করতে হলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আচরণ, ঘটনাবলি বা সমস্যা সম্পর্কে প্রণালিবদ্ধ ও যুক্তিনিষ্ঠ পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করতে হয়। সমাজ-গবেষণায় বিভিন্ন পদ্ধতি দ্বারা আমরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আচার-আচরণ উপলব্ধি করার প্রয়াস চালিয়ে যাই। সামাজিক সমস্যাবলি পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য কিছু কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বর্তমান গবেষণায় মূলত ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এর সাথে অন্যান্য পদ্ধতি ও কার্যধারাও অবলম্বন করা হয়েছে। বিশেষ করে, পর্যবেক্ষণ মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ব্যবহৃত উৎসসমূহ

বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক এবং দ্বৈতীয়িক উভয় ধরনের উৎসের ওপরই নির্ভর করা হয়েছে। এই গবেষণাকর্মে

প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তৎকালীন দৈনিক পত্রিকা, সাময়িকী, লিটল ম্যাগাজিন, স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী, স্মরণিকা, পোস্টার ও ফেস্টুনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উৎস।

দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণাকর্ম, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গ্রন্থ, সমালোচনা গ্রন্থ ও জার্নাল ইত্যাদি।

চিত্র শিল্পীদের রূপান্তর

পাকিস্তানের প্রথম দিকে বেশিরভাগ শিল্পী পাশ্চাত্যধারা অন্ধ অনুকরণ করতেন এবং পরে অনেক শিল্পী মুসলিম ভাবধারায় চিত্রাঙ্কন করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শাসকগোষ্ঠীর আনুকূল্য পাবার আশায় আবার কখনো শাসকগোষ্ঠীর প্রলোভন ও চাপে শিল্পীগণ পাকিস্তানি এবং মুসলিম ভাবধারায় চিত্রাঙ্কন করেছেন।[৪] এ প্রসঙ্গে আহম্মেদ শরীফ, 'বাঙালিত্বের বিকাশ ও রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া : বিশশতকের ষাটের দশক' পিএইচডি অভিসন্দর্ভে বলেছেন,

> সংগীত-শিল্প-সাহিত্য যদি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে তাহলে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ও উন্নতি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে–সে সংস্কৃতি হয় সরকারমুখী। পাকিস্তান আমলে এ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা (B.N.R) কে সরকার কাজে লাগিয়ে শিল্পকলাকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসার চেষ্টা করে।[৫]

শিল্পীরা সরকারের এই প্রভাব কাটিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করে গণমুখী শিল্প সৃষ্টির চেষ্টা করেন।[৬] পাশ্চাত্য শিল্পরীতি এবং মুসলিম ভাবধারায় চিত্রাঙ্কনে প্রথম আঘাত আসে ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সময়। কারণ, ভাষা আন্দোলন ও ৫৪-এর নির্বাচন জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখেছিল। চিত্রকলার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসানের সমসাময়িক কাজে তার প্রতিফলন দেখা গেছে। এ সময় তাঁরা জাতীয় ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলার প্রতি নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করেন।[৭] জয়নুল আবেদিন পূর্ব বাংলার লোকশিল্প ঐতিহ্যের সাথে আধুনিক শিল্পের সমন্বয় করে একটি সিরিজ আঁকেন। 'পাইন্যার মা', 'নব বধূ', 'পল্লীজননী', 'দুই রমণী', 'প্রসাধনরত নারী' ইত্যাদি রোমান্টিক মেজাজের কাজে লোকজ ও আধুনিক ধারার সমন্বিত আঙ্গিকের অন্যতম দৃষ্টান্ত। বাংলার চিত্রকলার আধুনিক মূল শক্তি হবে লোকজ-ঐতিহ্য, এমন বিশ্বাস থেকেই জয়নুল এই সমন্বয়ী ধারাটির চর্চা শুরু করেছিলেন।[৮] দেশাত্ববোধের প্রবল চেতনা, আপন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের কারণে জয়নুল আবেদিনের পক্ষে সমন্বয় ধারাটির চর্চা শুরু করা সম্ভব হয়েছে। পরবর্তীকালে অনেক শিল্পী শিকড়ে ফিরে আসেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন শিল্পী কামরুল হাসানও। ১৯৬০ সালে বিসিক-এ যোগদানের ফলে কামরুল হাসানের লোকশিল্প ও হস্তশিল্পের সাথে যোগাযোগ আরও নিবিড় হয়। তখন বাঁশ, বেত, শোলা, নকশীকাঁথা, পিতল-কাঁসার কাজের সাথে শখের হাঁড়ি, তেলের ভাঁড়, দইয়ের হাঁড়ি, কলসি, শিকা, জামদানি শাড়ির নকশা ও ডিজাইন দেখে অভিভূত হন।[৯] পরবর্তী সময়ে তিনি শিল্পীদেরকে এগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য উৎসাহ দেন ও প্রেরণা জোগান।

উপর্যুক্ত শিল্পীদের বাইরেও অনেকে বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করেন। আমিনুল ইসলাম[১০], জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসান-এর পথ অনেক শিল্পীই অনুসরণ করেন। যা বাঙালির নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে বাঙালিত্বের ভিতকে শক্ত করে।

চিত্রকলার জাতীয় ধারা বা মতবাদ

পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকে সামাজিকভাবে এদেশের শিল্পমাধ্যম যে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তাতে মাঝে মাঝে একটু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এ রকম একটি পরিবর্তন হলো চারুকলা ইনস্টিটিউটে ১৯৫৪ সালে মেয়েদের ভর্তি হওয়া। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজের ভ্রুকুটি, সমালোচনা ইত্যাদি বাধা ডিঙিয়ে পাঁচজন[১১] মেয়ে চারুকলায় শিক্ষা গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসেন।[১২] এরপর থেকে মেয়েদের চারুকলায় ভর্তি হওয়া অব্যাহত ছিল। ক্লাসরুমে প্রচলিতভাবে ছাত্র ও ছাত্রীদের ভিন্নভাবে বসার নিয়ম ছিল। ১৯৫৬ সালে যে তিনজন মেয়ে (আফরোজ মোস্তফা, অ্যাডলিন ডায়াস ও ইকবাল মান্দ বানু) ভর্তি হয়েছিলেন, তারা ছেলে সহপাঠীদের সঙ্গে মিলে এই প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এক সঙ্গে বসা শুরু করে। তাদেরকে এজন্য শাস্তি ভোগ করতে হলেও তা ছিল প্রচলিত রক্ষণশীল সমাজে এক ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন।[১৩] কিন্তু এই পরিবর্তন টেকসই হবার পূর্বেই পাকিস্তানে জারি করা হয় সামরিক শাসন। ষাটের দশক প্রায় পুরো সময়টা আইয়ুব খান এবং পরবর্তীকালে ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের অধীনে ছিল।

পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং বাঙালি সমাজের সাংস্কৃতিক ও রাজনীতির দ্বন্দ্ব

মানবতাবোধ-ধর্মনিরপেক্ষতা-সাম্য এই উপাদানগুলোর নির্যাস হলো বাঙালিত্ব। এই উপাদানগুলোকে সমাজে বাস্তবায়ন করার উদ্দীপনা মুক্তিযুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। সমাজের আত্মরক্ষা, আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশোন্মুখ জাতি হিসেবে প্রকাশ প্রয়াসে শিল্পীরা অংশী হয়েছিলেন সেই সমাজের দায়িত্বশীল অংশ হিসেবে। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ মুক্তির আশায় এবং শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণ, অত্যাচার থেকে নিজস্ব জাতিসত্তার অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে বাঙালি শিল্পীরা তাদের তুলি সঞ্চালিত করেছেন মানবতাবাদী চেতনার পথে।[১৪]

পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে শিল্পীদের আন্দোলন-সংগ্রামে চিত্রশিল্পী

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর, কিংবা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই বাঙালির পশ্চিম পাকিস্তানি সংস্কৃতির সাথে দ্বন্দ্ব, বিরোধ এবং বৈপরীত্য সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ওই দ্বন্দ্ব, বিরোধ এবং বৈপরীত্য আরেক তীব্রতা ও প্রখরতা লাভ করেছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র, পাকিস্তান রাষ্ট্রের মতাদর্শ বনাম পূর্ব বাংলার সমাজ, পূর্ব বাংলার সমাজের সাংস্কৃতিক মতাদর্শকে কেন্দ্র করে। যেক্ষেত্রে পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের মতাদর্শ স্বাভাবিক বলে প্রতিভাত হয়েছিল, সেক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার সমাজ এবং সমাজ গঠনের সাংস্কৃতিক মতাদর্শ তখনও ঘনীভূত বা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি।[১৫]

পাকিস্তানি রাষ্ট্রের মতাদর্শ সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রথম থেকে একই ছিল। সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় পাকিস্তানি ও মুসলিম ঐতিহ্যের জন্য প্রণোদনা প্রদান করা হয়। এ সময় শিল্পীদের ছবির মধ্যে 'পাকিস্তানি ধুয়ো চালু হয়েছে, না হিন্দুয়ানার ছাপ আছে'–এই অতি হীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তথ্য অনুসন্ধানে সরকার পক্ষ থেকে তৎপর হয়। শুধু তাই নয়, কিছু কিছু শব্দের প্রয়োগ তারা আপত্তি জানান। সেসব শব্দের মধ্যে হিন্দুয়ানির ছাপ আছে সেগুলো পরিবর্তন করার জন্য উৎসাহিত করেন। যেমন– 'আলপনাকে' আলপনা বলা চলবে না, বলতে হবে 'হাসিয়া'।[১৬] এ দেশের সংস্কৃতিকে ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ করার যে অপচেষ্টার অংশ ছিল।[১৭] রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্রসংগীত-বিরোধীদের ষড়যন্ত্র, অপপ্রচার সম্পর্কে এখানকার সাংস্কৃতিক মহল সার্বিকভাবে জানতেন। ফলে শিল্পীরা এসব প্রচারণা ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন। পাকিস্তানি শাসকশক্তির বিরুদ্ধে ১৯৪৮ থেকে দেশ জুড়ে যে আন্দোলন হয়েছিল তার প্রতিটি ধাপেই শিল্পীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। শুধু যে শিল্পকর্মের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হন তা নয়, রাজনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হন। পাকিস্তান আমলের প্রথম পর্বে চিত্রশিল্পের বিষয় বা বক্তব্য ছিল প্রধানত, অরাজনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ।[১৮] পরবর্তীকালে বাংলার লোক ঐতিহ্য, দুর্যোগ, প্রতিরোধ ইত্যাদি শিল্পীরা তাদের কর্মের মধ্যে নিয়ে আসেন। ফলে চিত্রকলায় যে সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন আসে তা বাঙালিত্বের ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করে।

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ঢাকার শিল্পশিক্ষালয়ের ছাত্রদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়। সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের পক্ষে জনতার কাতারে এসে দাঁড়ানো কোনোভাবে সম্ভব ছিল না; কিন্তু সর্বাংশে ছাত্রদের সম্পৃক্তি ও সক্রিয়তা থেকে বোঝা যায় শিক্ষকদের সমর্থন কোনদিকে রয়েছে।[১৯] ২২শে ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৫২ এ একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধনের তারিখ নির্ধারিত ছিল। চারুশিল্পকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য ঢাকা আর্ট গ্রুপের এটি দ্বিতীয় প্রদর্শনী ছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের স্ত্রী লেডি নূন-এর উদ্বোধন করার কথা ছিল।[২০] কিন্তু ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা আন্দোলনের ছাত্রমিছিলে পুলিশের গুলিতে ছাত্রদের নিহত হওয়ার ঘটনার কারণে তা স্থগিত করা হয়।[২১] ছাত্র ও শিক্ষকরা সেদিন প্রদর্শনী বন্ধ করে ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন।[২২] শিল্পীরা শুরু থেকেই বাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন শহিদ মিনারের সামনে প্রদর্শনের জন্য নিজে ব্যানার এঁকেছেন, ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনগুলোর জন্য প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন, লিখেছেনও এগুলোতে, আর মিছিলেও তিনি অংশ নিয়েছেন।[২৩]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পেছনে মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রবল প্রভাব থাকলেও বছর না ঘুরতেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিকল্প পথ ধরতে উদ্যোগী হয়েছিল। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে তাদের মাতৃভাষা বাংলার ন্যায্য মর্যাদার দাবিই এক্ষেত্রে মূল প্রেরণা ও শক্তি হিসেবে কাজ করে। উদারপন্থি রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাশাপাশি প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-শিক্ষকরাই এতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী' আন্দোলন অগ্রসর হতে থাকে। এই আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে

সম্পৃক্ত ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পীদের নেতৃস্থানীয় এক অংশ।[২৪] ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের বর্ণনা দিয়ে শিল্পী সৈয়দ জাহাঙ্গীর বলেন,

> ... একুশে ফেব্রুয়ারিতে একটা বড় মিছিল বের করা হয়। এর আগের রাতে সারারাত ধরে অনেকে মিলে আমরা পোস্টার, ব্যানার লিখি। সকালে ওই ব্যানার-পোস্টার নিয়ে আমরা মিছিলে অংশগ্রহণ করি। বড় ব্যানারটিতে আঁকা ছিল এক ব্যক্তি একজন ছাত্রের লাশ দুহাতে তুলে নিয়ে মিছিলের অগ্রভাগে এগিয়ে যাচ্ছেন।[২৫]

১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণকারী ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্র তরুণ শিল্পী আমিনুল ইসলাম, রশিদ চৌধুরী, ইমদাদ হোসেন, কাইয়ুম চৌধুরী ও মুর্তজা বশীরের তুলির বলিষ্ঠ রেখায় আঁকা পোস্টার শিক্ষাঙ্গনে, রাস্তায়, গলিতে সেঁটে দেয় এবং এই শিল্পকর্মগুলো ভাষা আন্দোলনকে করেছেন আরও বেগবান। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এই স্লোগানে ভরে গিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দেওয়াল, এমনকি গাছের কাণ্ডগুলোও। মুর্তজা বশীর একুশের রাতেই একুশের গুলিবর্ষণ ও নিহতদের নিয়ে এঁকে ছিলেন কয়েকটি স্কেচ।[২৬] তাঁর রেখাগুলোও ছিল বলিষ্ঠ এবং ভাষা আন্দোলনে তা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল।

১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম বার্ষিকী স্মরণে রেখে হাসান হাফিজুর রহমান ও মোহাম্মদ সুলতানের যৌথ উদ্যোগে যে সংকলন প্রকাশের প্রয়াস নেওয়া হয় সেখানে নবীন শিল্পশিক্ষার্থীদের ঘনিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। সংকলনের জন্য লিলোকাট ও ড্রইং করেছিলেন মুর্তজা বশীর ও বিজন চৌধুরী। একুশের প্রথম সংকলন *একুশে ফেব্রুয়ারি*-এর প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন আমিনুল ইসলাম।[২৭] একই সংকলনে 'একুশে ফেব্রুয়ারি' নামে একটি লেখা ছিল মুর্তজা বশীরের।[২৮] আর সদরঘাট থেকে যে মিছিল বের হয়েছিল তাতে আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা যোগ দিয়েছিলেন চিত্রিত ফেস্টুন নিয়ে এবং মিছিলের পুরোভাগে রশীদ চৌধুরী, মুর্তজা বশীরের সঙ্গে ছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী।[২৯]

ভাষা আন্দোলনের পর পাকিস্তানের এই অংশের রাজনৈতিক মঞ্চের অতিদ্রুত দৃশ্যবদল ঘটে। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অগ্রণী রাজনৈতিক দল ইসলামি ভাবধারার মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ও গণতান্ত্রিক উদারনৈতিক যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতা লাভ ও হারানো, মার্শাল ল ও সামরিক শাসনের প্রতিষ্ঠা, সবই এক দশকের মধ্যেই সংঘটিত হয়।[৩০] ১৯৫৮ সাল থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সমাজকর্মী, লেখক, শিল্পী-সাহিত্যিক প্রভৃতি গোষ্ঠীর মধ্যে খেতাব ও পদক উপহার হিসেবে বিতরণ শুরু করেছিল।[৩১] বহুসংখ্যক লেখক ও শিল্পী শাসকগোষ্ঠীর প্রলোভনে বিভ্রান্ত হন।[৩২] এ ব্যাপারে শিল্পীদের মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি হয়।[৩৩] জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান ও অন্যান্য শিল্পীর কর্মে পাকিস্তানের সমসাময়িক[৩৪], রাজনৈতিক, শিক্ষা সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং জীবনে যেকোনো প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর স্পষ্ট উচ্চারিত হয়েছে। এ সময়ের কাজগুলোর মধ্যে *সংগ্রাম*, *বিদ্রোহ*, *প্রত্যাবর্তন*, *ঝড়*, *জমিতে মই দেওয়া* প্রভৃতি। জয়নুল আবেদিনের এই কাজগুলোর মূলভাব হলো–বাঁচার জন্য সংগ্রাম এবং যেকোনো প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। ষাটের দশকে শিল্পীসমাজ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র

তুলে ধরে, 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন'[৩৫] শিরোনামে সাড়া জাগানো পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছিল।[৩৬] এই পোস্টারের মাধ্যমে বাঙালিরা পাকিস্তানের শোষণের বিষয়টি সহজভাবে বুঝতে পেরেছিল।

১৯৬৬ সালে তদানীন্তত পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় রাজনৈতিক নেতৃত্ব ৬ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে আন্দোলনকে সুসংগঠিত রূপ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, এর সাথে চিত্রশল্পীগণ সরাসরি যুক্ত হন।[৩৭] ৬ দফার লোগো, পতাকা, প্রচার পুস্তিকা, প্রচ্ছদ ও পোস্টার প্রভৃতি শিল্পীগোষ্ঠী দলবদ্ধভাবে সম্পন্ন করেন।[৩৮] শিল্পী হাশেম খান ছয়রঙের সমন্বয়ে ছয়দফার একটি ডিজাইন তৈরি করে দেন। মো. আবুল হাশেম খান এ বিষয়ে বলেন, ছয় দফার একটি মর্মার্থ হলো– আমাদের দেশে ঋতুর সংখ্যা ছয়। ঋতুগুলো আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ছয়দফাও ঠিক তেমনি করেই বাঙালির আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্বের প্রতীক। তাই ছয়দফা ঘোষণার জন্য যে মঞ্চ তা ঘোষণাপত্রের ডিজাইন অনুসারেই ডিজাইন করা হয়।[৩৯] হাশেম খান ছয়দফা ঘোষণার মঞ্চ তৈরি করে দেন। তিনি বীরেন সোম, আবুল বারক্ আলভী ও মঞ্জুরুল হাই এই তিনজনের সহায়তায় মঞ্চ বানানোর কাজটি সম্পন্ন করেন।[৪০] ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বাঁচার দাবি হিসেবে ৬ দফা কর্মসূচিকে ব্যাখ্যা করেন।

চিত্রশিল্পীদের সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যক্রম

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রধান ভয় ছিল বাঙালিকে নিয়ে। তারা কখনো হিন্দু সংস্কৃতির নামে কখনোবা সমন্বয়ের নামে বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে। শিল্পী সমাজ এইসব আগ্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে বাঙালির সংস্কৃতির পক্ষে।

বাংলা নববর্ষ পালনের শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিয়ত বাধা দিয়েছে। এটাকে চিহ্নিত করেছে বিজাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে। শিল্পীগণ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ঢাকা শহরে তারা বৈশাখী মেলা আয়োজনও করেন।[৪১] বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কারুশিল্পীরা তাদের সৃষ্টির সম্ভার নিয়ে রাজধানী ঢাকায় পয়লা বৈশাখে মিলিত হন। বাঙালিত্বের চেতনা প্রসারের লক্ষেই ঢাকায় বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়।[৪২] একইসাথে শাসকদের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এক বিমূর্ত প্রতিবাদ হলো এই বৈশাখী মেলা। বাঙালিরা এই মেলাগুলোতে তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। তাদের সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা জানানোর উপলক্ষ্য খুঁজে পায়।

শিল্পীদের কাজের পরিধি যতদূর বিস্তৃত ছিল সেখানেই তাঁরা তাঁদের শিল্পকর্মের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এমনই এক ধরনের প্রতিবাদ শিল্পীরা পত্রিকায় কার্টুন এঁকে করেছেন। অর্থাৎ পত্রিকায় কার্টুন এঁকে শিল্পীরা শাসকগোষ্ঠী চরিত্র ফুটে তুলতে সহযোগিতা করতো। এ প্রসঙ্গে রফিকুন নবী বলেন,

> ... রেহমান সোবহান সাহেবেদের কথা ফেলতে না পেরে আমাকে তাঁদের পত্রিকাটিতে[৪৩] যুক্ত করেছিলেন। পত্রিকাটিতে পাকিস্তানের রাজনীতির খুঁটিনাটি নিয়ে সমালোচনাধর্মী লেখালেখিই ছিল প্রধান। আমিও তাতে কার্টুন এঁকে মজাই পেতাম।[৪৪]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান ও রচনাকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রের সংহতির জন্য হুমকি মনে করত। তারা মনে করত ভাষার এই সেতুবন্ধনের মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে মানসিক সান্নিধ্য বৃদ্ধি পেলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য তা বিপদের কারণ। এই ভাবনা থেকে ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী এক বিবৃতি দিয়ে বেতার ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীতের সম্প্রচার হ্রাস করার নির্দেশ দেয়। বাঙালি এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে রুখে দাঁড়ায় এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করে। এর প্রতিবাদে জয়নুল আবেদিনসহ ১৯ জন চিত্রশিল্পী প্রতিবাদ করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেয়।[৪৫] এর অল্পকাল পরে আনিসুজ্জামান সম্পাদিত *রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থটির জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি এঁকে দেন।[৪৬]

আটষট্টি-উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে বাঙালি সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ ঘটে। সমাজের অগ্রসর ও সংবেদনশীল অংশ হিসেবে আর্ট কলেজের ছাত্ররা ও শিল্পীসমাজ এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আটষট্টির ২১শে ফেব্রুয়ারিতে তাঁরা (আমিনুল ইসলাম, রশিদ চৌধুরী, ইমদাদ হোসেন, কাইয়ুম চৌধুরী ও মুর্তজা বশীর) রাজপথসহ বিভিন্ন স্থানে আলপনা আঁকার রীতি প্রবর্তন করে। শহিদ মিনার থেকে আজিমপুর গোরস্তান পর্যন্ত পুরো রাস্তায় বাঙালি সংস্কৃতির নিদর্শনস্বরূপ অঙ্কিত আলপনা বাঙালির চেতনায় ভিন্ন একটি মাত্রা যুক্ত করে দিয়েছিল। শিল্পীদের একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক দল তদানীন্তন ডাকসু নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় এই প্রদর্শনী ও আলপনা আঁকার কাজ সংঘঠিত করেছিল।[৪৭]

উনসত্তরের ২১শে ফেব্রুয়ারি চিত্রশিল্পীরা শুধু আলপনা অঙ্কনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি; বরং তাঁরা চিত্রকলাকে সাধারণ মানুষের সামনে নিয়ে এসেছিলেন। সেবারই প্রথম শহিদ মিনার চত্বরে বিশাল আকারের ক্যানভাসে ছবি এঁকে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দশ-বারো ফুট আকারের ক্যানভাস জুড়ে ছিল সাধারণ মানুষের বঞ্চনার চিত্র-স্বৈরাচারী শাসকের নিপীড়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের কথা, শোষণ ও বঞ্চনার কথা, অসাম্প্রদায়িক বোধ ও মানবিক অধিকারের কথা। ছবি এঁকেছিলেন জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, রশিদ চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম, মুস্তাফা মনোয়ার, হাশেম খান, রফিকুন নবী এবং আরও অনেকে।[৪৮] শহিদ মিনারে এই চিত্রপ্রদর্শনীর মাধ্যমে শিল্পীরা জনসাধারণের কাছে পাকিস্তানি শাসকদের অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেছিলেন। এছাড়া ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত শিল্পীরা বিভিন্ন বার্তা বহনকারী ব্যানারের প্রদর্শনী করে এসেছেন। ১৯৬৮ সালে বার্তা বহনকারী ব্যানারের সিরিজ এবং ১৯৬৯ সালের শহিদ মিনারে স্বরবর্ণের ব্যানার প্রদর্শনীর মাধ্যমে আন্দোলনে নবতর শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল। এভাবে পুরো ষাটের দশক জুড়েই বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন এক বিরাট বাঁক নিয়েছিল। শিল্পী কামরুল হাসান বিক্ষুব্ধ শিল্পীসমাজের ব্যানারে উনসত্তর সালে বাংলা একাডেমিতে বক্তব্য প্রদান করেন। এই বছরেরই ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমির বটমূলে তিনি অক্ষরবৃক্ষের প্রথম উদ্বোধন করেন।[৪৯] উনসত্তর বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন এক বিরাট বাঁক নিয়েছিল। এ বছর ২১শে ফেব্রুয়ারির স্লোগান ছিল–'আমার পলাশ ফোটার দিন'। অর্ঘ্য হিসেবে শহিদ মিনারে শুধু ফুলের বলয় দেওয়ার বদলে 'অ' 'আ' অক্ষরের ফুলেল বলয় এবং আন্দোলনের বার্তা বহনকারী স্বরবর্ণের ব্যানার শহিদ মিনারে টাঙানো হয়। এই প্রদর্শনীর আয়োজন

করেছিল আর্ট কলেজের ছাত্র সংসদ এবং প্রদর্শনীর স্ক্রিপ্ট তৈরি করেছিলেন মুস্তাফা মনোয়ার, শাহাদাত চৌধুরী ও রফিকুন নবী।[৫০]

৬৯-এর গণ আন্দোলনের ফলশ্রুতি জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে আয়োজিত 'নবান্ন' চিত্র প্রদর্শনী ও 'সোনার বাংলা শ্মাশান কেন' স্লোগানের সমধর্মী সাহসী শিল্পকর্ম ৬৪ ফুট দীর্ঘ স্ক্রল চিত্র।[৫১] বস্তুত ষাটের দশকের শেষভাগে ঢাকা আর্ট কলেজের হোস্টেল বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। চিত্রশিল্পীরা হোস্টেলে রাত জেগে হাজার হাজার পোস্টার, কার্টুন, ব্যানার অঙ্কনের কাজ করেন। দেশব্যাপী উত্তাল আন্দোলন তখন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। স্বাধীনতা–এই চারটি অক্ষরের প্ল্যাকার্ড নিয়ে আর্ট কলেজের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ মিছিল বের করেছিলেন। ছাত্রছাত্রীরা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ওপর রচিত ছড়ার বই 'উনসত্তরের ছড়া' প্রকাশ করে। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন–নিতুন কুণ্ডু ও বিনোদ মণ্ডল। কার্টুন এঁকেছিলেন–রফিকুন নবী। সম্পাদনা ও পরিকল্পনায় ছিলেন–শাহাদাত চৌধুরী ও রফিকুন নবী। সহযোগিতায় ছিলেন–মঞ্জুরুল হাই, আবুল বারক্ আলভী, শিলাব্রত চৌধুরী, বীরেন সোম ও মোহাম্মদ আকতার ।

১১ দফা আন্দোলনের সঙ্গে আর্ট কলেজের ছাত্ররা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। আন্দোলনের জন্য আর্ট কলেজের ছাত্ররা পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন তৈরি করত। প্রতিদিন কমপক্ষে এক রিম কগজে পোস্টর লেখা হতো। এর অর্থ দৈনিক সর্বনিম্ন পাঁচশত পোস্টার লেখা হতো।[৫২]

১৯৭০ সালে জয়নুল আবেদিন শুধু যে ৩০ ফুট দীর্ঘ *মনপুরা* স্ক্রলটিই এঁকেছেন তা নয়, পাশাপাশি এ বিষয়ে অনেক মাঝারি আয়তনের ছবিও এঁকেছিলেন যার একটিতে মওলানা ভাসানীর প্রতিকৃতি এঁকেছেন দুর্যোগাক্রান্ত মানুষের ত্রাণকর্তা হিসেবে।[৫৩] কিন্তু, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর রাজনৈতিক দলের নেতাদের অনেকেই শিল্পী-সাহিত্যিক তথা বুদ্ধিজীবীদের একতরফাভাবে পাকিস্তানিদের তাঁবেদার এবং 'মেরুদণ্ডহীন সমাজ' বলে আখ্যায়িত করতে থাকেন।[৫৪] কামরুল হাসান রাজনীতিবিদদের একচেটিয়া অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, ১৯৭১-এর মার্চ মাসের চরমতম অবস্থায় শিল্পীগোষ্ঠী এক প্রহরও নষ্ট করেননি। একইসাথে তিনি মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরিতে শিল্পীদের ভূমিকা তুলে ধরে বলেন,

> স্বাধীনতাযুদ্ধকালে মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের প্রচার বিভাগ থেকে 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' নামে ইয়াহিয়া খানের যে দানবীয় প্রতিকৃতিটি পোস্টার আকারে প্রচারিত হয়েছিল, তা আমার নিজের হাতে আঁকা। শুধু মুজিবনগরে বসেই আমি ইয়াহিয়া খানকে দানবের মূর্তিতে আঁকিনি, আমি ১৯৬৯ সাল থেকেই গোপনে ঢাকায় বসেই ওই প্রতিকৃতি আঁকতে থাকি। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ শহীদ মিনারে কমপক্ষে ১০টি ওই প্রতিকৃতির পোস্টার আঁকা হয়েছিল। সেই পোস্টারে লেখা ছিল, 'এই জানোয়ারটা আবার আক্রমণ করতে পারে'।[৫৫]

শিল্পীদের কাছে চিত্রাঙ্কন শুধু শিল্পচর্চা ছিল না, বরং তাঁরা তাঁদের কাজকে দেশমুক্তির ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। জয়নুল আবেদিন চিত্রকলার আন্দোলন আর জাতিসত্তার

আন্দোলনকে একই সূত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন। তারই চূড়ান্ত রূপ হলো একাত্তরে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে চারুশিল্পী সংসদ আয়োজিত 'স্বাধীনতা'–এই চারটি অক্ষরকে বুকে নিয়ে শিল্পীদের মিছিল। 'স্বাধীনতা' শব্দটির চারটি অক্ষর সেদিন অসাধারণ উজ্জ্বলতায় বাংলাদেশের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তুলেছিল। ঢাকার রাজপথে সেদিন চার অক্ষরের এই প্রদর্শনী এক যুগান্তকারী ঘোষণা এসে হাজির করেছিল।[৫৬] সেই মিছিলে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন নেতৃত্বদানের অসমসাহসী দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[৫৭]

শিল্পীরা সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না হয়েও বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনে অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত মওলানা ভাসানীর জনসভায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার পক্ষে ভাষণ দিয়েছিলেন জয়নুল আবেদিন। ১৯৭১ সালে নিরীহ বাঙালিদের ওপর স্বৈরাচারী পাকিস্তানি শাসকের লেলিয়ে দেওয়া হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার প্রতিবাদে এবং অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে পাকিস্তান সরকারপ্রদত্ত সম্মানজনক উপাধি 'হিলাল-ই-ইমতিয়াজ' জয়নুল আবেদিন প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের রেখাচিত্র বা ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর মনপুরা দ্বীপে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় অবলম্বনে চিত্রিত 'মনপুরা-৭০' বিবেকবান মানুষকে নাড়া দেয়।[৫৮] দুর্যোগকে কেন্দ্র করে একই আঙ্গিকে জয়নুল এঁকেছিলেন দুঃস্থ মানবতার ত্রাণকর্তা হিসেবে বিপ্লবী জননেতা মওলানা ভাসানীর ছবি।[৫৯] জয়নুল পাকিস্তান আমলে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ ছবি এঁকেছেন।[৬০] ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের পর কামরুল হাসান ইয়াহিয়া খানের দশটি কার্টুন আঁকেন। শহিদ মিনারের দেওয়ালে দেওয়ালে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই পোস্টার যেখানে হিংস্র দানবাকৃতির ইয়াহিয়া খান শোভা পাচ্ছিল।[৬১] মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের রক্তপান ও হিংস্র মুখমণ্ডল-সংবলিত পোস্টার 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' চিত্রণ করে স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের আন্দোলনে উজ্জীবিত করেছিল।[৬২] মুক্তিযুদ্ধকালীন কামরুল হাসান মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অধীনে আর্ট ও ডিজাইন বিভাগের পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সময়ে তিনি আঁকেন ইয়াহিয়া খানের দানব মূর্তি। দাঁত বের করে হিংস্র বাঘের মতো সেই লাল দুই কষ বেয়ে নেমে আসছে। মানুষ মুখো শিকার ধরার পর যেমন করে থাকে ঠিক সে রকম। ছবির নিচে তিনি লিখলেন : এই জানোয়ারটাকে হত্যা করুন। সেই পোস্টার হাজার হাজার কপি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল মুক্তাঞ্চলে, যেখানে মুক্তিযোদ্ধারা ছিল। বাংলাদেশের ভেতরেও সেই পোস্টার নিয়ে গিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযুদ্ধের সময় আর কোনো ছবি মুক্তিযোদ্ধাদের মতে এত উৎসাহ, জেদ, জিঘাংসা সৃষ্টি করেনি। এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধের আইকনিক ছবি।[৬৩]

পোস্টার-চিত্র

ভাষা আন্দোলনের কাল থেকে পোস্টার-চিত্রে যে সফলতা এসেছে, এর পেছনে যে বস্তুটি কাজ করেছে, তা বাংলার তরুণ শিল্পীদের সংগ্রামী চেতনা।[৬৪] এদেশে পোস্টার বা প্রাচীরচিত্রের মূল উৎসের সৃষ্টি হয়েছিল বাংলার সাত কোটি মানুষের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার

সংগ্রামের ভেতর দিয়ে। এই শিল্পের অভিযাত্রাকে কোনো বাধা রুদ্ধ করতে পারেনি। বরং যত বাধা এসেছে, শিল্পীদের অনুশীলন ততই প্রখর হয়ে উঠেছে।[৬৫]

১৯৫২ সালের শেষার্ধে কুমিল্লায় যে সাংস্কৃতিক সম্মেলন হয়েছিল, তাতে শিল্প প্রদর্শনী একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কেবল প্রদর্শনীতে ছবি দিয়েই শিল্পীরা তাঁদের দায়িত্ব শেষ করেননি। বরং দলবদ্ধভাবে সম্মেলনকে সার্থক করে তোলার সবরকম প্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তখনকার সরকার এসবকে পাকিস্তানবিরোধী কার্যকলাপ হিসেবেই গণ্য করত।[৬৬]

১৯৫৪ সালের নির্বাচন উপলক্ষ্যে যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন দিয়ে শিল্পীরা উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে হাজার হাজার দেওয়ালচিত্র, ব্যানার ও ছবি এঁকেছিল, তা নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাবিত করেছিল। শিল্পীরা তৎকালীন সব আন্দোলন সংগ্রামে অংশ নিতেন। এ প্রসঙ্গে শিল্পী কামরুল হাসান বলেন,

> পাকিস্তানি চক্রের বিরুদ্ধে .. বাংলাদেশের কিছুসংখ্যক ছাড়া সবাই আপন আপন বিবেক-বিবেচনা ও মানবতাবোধের তাড়নায়ই তুলির ললিত রেখা বন্ধ রেখে সংগ্রামী বলিষ্ঠ রেখাকেই হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। শিল্পীরা এসব করেছেন সবরকম বিপদের ঝুঁকি নিয়েই। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাঁরা প্রমাণ রেখেছেন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, প্রতিরোধে একাত্মতা, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই এর প্রমাণ মেলে।[৬৭]

পাকিস্তান আমলে আন্দোলন সংগ্রামে পোস্টার-চিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ওই সময়ের প্রযুক্তি আজকের মতো উন্নত ছিল না। পোস্টার আঁকার কাজ শিল্পীদেরকেই করতে হতো। শিল্পী হাশেম খান ষাটের দশকে পোস্টার-ফেস্টুন, প্রচার পুস্তিকার প্রচ্ছদ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন,

> ...সেই ষাটের দশকে কত পোস্টার-ফেস্টুন যে এঁকেছি, ছবি এঁকেছি, প্রচার পুস্তিকার প্রচ্ছদ এঁকেছি আর তার হিসাব মেলানো কঠিন কাজ।[৬৮]

রফিকুন নবী পাকিস্তানি শাসনের সময়ের কার্টুন-পোস্টার করা নিয়ে স্মৃতিচারণ করে বলেন,

> ২৫ মার্চের আগে পর্যন্ত সেই যে আইয়ুব খানদের নিয়ে কার্টুন-পোস্টার করা তা খুবই গোপনীয় ছিল বলে ক্লাসে বাইরের বন্ধুদের কাছেও তা বলাবলি হতো না। না আমি, না হাসান, কেউই এটা প্রকাশ করিনি। এই কাজ নিয়মিতই চলছিল। তবে একসময় বাড়িতে দরজা কপাট লাগিয়ে গভীর রাতে সেসময় করতাম। হাসান আর নুরুর রহমান সেসব নিতে যেত। একসময় এই আঁকা ভালো লাগার পর্যায়েই পৌঁছে গেল। বিপদের ভয় সত্ত্বেও উদ্দীপনায় পেয়ে বসেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সেগুলো দেয়ালে দেয়ালে সাঁটা হতো দেখে ভালো লাগত। ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা রাতের অন্ধকারে অত্যন্ত রিস্কি এই কাজ করত বিপদ-আপদকে তুচ্ছজ্ঞান করে। বিস্মিত হতাম তাদের সাহস দেখে, ভাবতাম এই তরুণেরা যদি এমনটা পারে, তবে আমাদের আঁকায় ভয় কী।[৬৯]

এভাবে রাজনীতি নিয়ে ভাবনা, নিপীড়িত মানুষদের নিয়ে সোচ্চার আন্দোলন, মিটিং-মিছিল করে শিল্পীরা ভূমিকা পালন করেন। আর্ট কলেজের ছাত্র গোপেশ মালাকার কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত থাকায় জেল খাটতে হয়েছে। মুর্তজা বশীর, আমিনুল ইসলাম, ইমদাদ হোসেন, বিজন চৌধুরী প্রমুখ শিল্পী, কবি হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, গাফ্ফার চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন।[৭০] রফিকুন নবী শিল্পীদের আন্দোলন সংগ্রামে যুক্ত হওয়া বিষয়ে আরও বলেন, " ...শুধু রাজনীতিবিদ নয়, দেশাত্মবোধের ব্যাপারে যে-কোনো কর্মকাণ্ডে শিল্পীদের যুক্ততা থাকে। থাকতেই হয়। আমি পোস্টার-ব্যানার আঁকতে গিয়ে গর্বভরে ভাবতাম, 'যা করছি, ভাল করছি। তা যতই রিস্কি হোক না কেন।"[৭১]

জাতীয়জীবনের চরম পর্যায়ে শিল্পের চেয়ে মিছিল, স্লোগান এবং পোস্টারের মূল্য কোনো অংশে কম ছিল না। শিল্পীদের আশাবাদ এবং সংগ্রামী মনোবল আমাদের সচেতন শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[৭২]

অসহযোগ আন্দোলনে শিল্পীদের ভূমিকা

শিল্পীদের রাজপথে আন্দোলন সংগ্রাম করা যেমন কঠিন ছিল, তেমনি শিল্পকর্ম করাও ছিল কঠিন। শাসকগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত তাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখত। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত শহীদুল্লা কায়সারের *সংশপ্তক* উপন্যাসের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী। কিন্তু প্রচ্ছদের শিল্পীর নামের জায়গায় লেখা হলো অনামী। পাকিস্তানের সেই পরিস্থিতিতে দেবদাস চক্রবর্তীর নাম ছাপতে ইতস্তত করেছিলেন প্রকাশক। কারণ পাকিস্তান সরকার সবসময় এদেশের সব সংগ্রাম, আন্দোলনের ঘটনাকে ভারত ও হিন্দুদের কাজ বলে চালানোর চেষ্টা করেছে। এখানে শাসকগোষ্ঠীর সম্প্রদায়িক আচরণ আবারও স্পষ্ট হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বারা সব ধরনের কাজে শাসকগোষ্ঠী ভারতের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পেত। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবে তারা ভারত ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করে। ৫২-র ভাষা আন্দোলোনকে তখনকার *মর্নিং নিউজ* পত্রিকায় ভারত ও হিন্দুদের কাজ বলে অভিহিত করেছিল।[৭৩]

বাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় শিল্পীরা সবসময় সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনেও চারু ও কারু শিল্পীরাও পিছিয়ে ছিলেন না।

৫ মার্চ, ১৯৭১ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, সংগীত, নাটক, চারুকলা শিল্পীদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ৬ মার্চ ঢাকার শিল্পীসমাজ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'বিক্ষুব্ধ শিল্পীসমাজ' নামে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে।[৭৪] ইতিপূর্বে ৫ মার্চ থেকে বেতারের শিল্পীরা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে কর্মবিরতি করছিলেন। ৬ মার্চ ৩৩ জন চলচ্চিত্র শিল্পী, পরিচালক, প্রযোজক ও কুশলী অসহযোগ আন্দোলনে শরিক হয়ে ন্যায্য দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তা চালিয়ে যাওয়ার এক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন।[৭৫] রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক ও সাবেক মন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদ ৬ মার্চ এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন, অসহযোগ আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে সকল পূর্ব পাকিস্তানি সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তির প্রতি

খেতাব ও তমঘা বর্জনের আহ্বান জানানোর জন্য। তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় শেখ মুজিব গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ বাদ দিয়েছেন, তা হচ্ছে খেতাব ও তমঘা বর্জনের প্রশ্ন।'[৭৬] ৯ মার্চ বিক্ষুব্ধ শিল্পীসমাজ বেতার ও টেলিভিশনে মুক্তিসংগ্রামের চেতনাকে সদা জাগ্রত রাখার তাগিদে গণমুখী সংগীত, নাটক প্রচারের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে শর্তাধীন কাজে যোগ দেয়। কিন্তু গণহত্যার প্রতিবাদে শিল্পীরা তথ্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে যোগদানে অস্বীকৃতি জানান এবং একই সাথে তমঘা ও খেতাব বর্জনের আহ্বান জানান। শিল্পী মুর্তজা বশীর এ প্রসঙ্গে বলেন,

> বাংলার মাটিতে গণহত্যার প্রতিবাদে পাকিস্তান সরকারের তথ্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে যোগদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে এবং আমন্ত্রিত শিল্পীদের প্রতি অংশগ্রহণে বিরত থাকার জন্য আমার এক আবেদন সংবাদ সংস্থা এনা পরিবেশিত খবর ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই বিবৃতিতে আমি শিল্পী ও লেখকদের প্রতি অনুরোধ জানাই পাকিস্তান সরকার প্রদত্ত তমঘা ও খেতাব বর্জনের।[৭৭]

১০ মার্চ স্বাধিকার আন্দোলনে ব্যাপক গণহত্যার প্রতিবাদে এ চিত্র প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তুরস্ক, ইরাক ও পাকিস্তান–তিন দেশের ১০ জন করে শিল্পীর প্রদর্শনী হওয়ার কথা ছিল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাঁচজন–জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, মুর্তজা বশীর ও আরও দুইজনের অংশগ্রহণের কথা ছিল।[৭৮] ১০ মার্চ মুর্তজা বশীর পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে বলেন,

> মুক্তি ও স্বাধিকার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বাংলার নিরস্ত্র জনগণ যখন অকাতরে প্রাণ হারাচ্ছেন, ঠিক সে সময় আমি সচেতনশিল্পী হিসাবে ইসলামাবাদ সরকার কর্তৃক আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে পারি না।[৭৯]

তিনি দেশের সকল চিত্রকরদের উক্ত প্রদর্শনী বর্জনের আহ্বান জানান।[৮০] ১২ মার্চ ঢাকায় আর্ট কাউন্সিলে বিকেল ৪টায় চারু ও কারুশিল্পদের একসভায় কাইয়ুম চৌধুরী ও মুর্তজা বশীরকে আহ্বায়ক করে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ চারু ও কারু কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ শফিকুল হোসেন।[৮১] সভায় যে কর্মসূচিগুলো নেওয়া হয় তা হলো–১. বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের 'প্রতীক'[৮২]কে সর্বসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের সংগ্রামী মনকে প্রেরণা দেওয়া এবং উদ্বুদ্ধ করা। ২. সভা-মিছিলের সাইক্লোস্টাইল করে অথবা ছাপিয়ে দেশাত্মবোধক ও সংগ্রামী স্কেচ বিতরণ করা। ৩. আন্দোলনমুখী পোস্টার ও ফেস্টুন প্রচার। ৪. পোস্টার ও ফেস্টুনসহ মিছিলের আয়োজন। ৫. এই পরিষদের ইউনিটগুলোর বিশেষ জরুরি অবস্থায় অন্যান্য সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাজে অংশগ্রহণ।[৮৩]

১২ মার্চ কামরুল হাসানের আহ্বানে 'বাংলার পটুয়া সমাজ' নামে একসভা ঢাকার ধানমণ্ডির ২ নম্বর সড়কে অবস্থিত 'আর্টস এনসেম্বল' গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় কর্মপন্থা হিসেবে নেওয়া হয় : ১. কার্টুন, পোস্টার, লিফলেট প্রভৃতি সর্বত্র সঠিকভাবে বিলি-বিতরণের জন্য স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ২. প্রদেশের সব পটুয়া (চিত্রশিল্পী) 'আর্টস এনসেম্বল', ধানমণ্ডি ২ নম্বর সড়কে

যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়। ৩. বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধু ডিগ্রিধারী শিল্পী ছাড়াও সাধারণ সাইনবোর্ড পেইন্টার ও অন্যান্য সাধারণ শিল্পীকে সংগ্রামে শামিল করে সব ধরনের কাজে সাহায্য নিতে হবে। ৪. অবিলম্বে প্রদেশের সব পটুয়াকে কার্টুন, ফেস্টুন, লিফলেট ইত্যাদির জন্য 'লে-আউট' আর্টস এনসেম্বলে জমা দিতে অনুরোধ জানানো হয়। ৫. সংগ্রাম উচ্চ পর্যায়ে গেলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। সে অবস্থায় স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আর পটু হস্তে কার্টুন, ফেস্টুন ও পোস্টার করে সংগ্রামী বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পটুয়া সমাজ দৃঢ়সংকল্প। ৬. পূর্ব বাংলার পল্লী জনগণের হাটের, মাঠের ও ঘাটের অতি আদরের ফুল 'লাল শাপলা'কে সংগ্রামী বাংলার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার জন্য পটুয়া সমাজ সিদ্ধান্ত নেয়। যা বাংলার চারু ও কারুশিল্পী সংগ্রাম পরিষদের সভায়ও সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

১২ মার্চ কবি-সাহিত্যিকরা আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে 'লেখক সংগ্রাম শিবির' নামে একটি কমিটি গঠন করে এবং স্বৈরাচারী-ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন করে কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-জনতার মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন।[৮৪]

১৩ মার্চ বাংলার চারু ও কারুশিল্পী সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা স্টেডিয়ামের বাইরে একটি কার্টুন চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। *দৈনিক পাকিস্তানের* শেষ পাতায় রফিকুল হাসানের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, 'ব্যঙ্গচিত্রগুলো শত্রুকে চিনিয়ে দিয়েছে।'[৮৫]

১৫ মার্চ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার বঞ্চিত করার প্রতিবাদে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন তাঁর 'হিলাল-ই- ইমতিয়াজ' উপাধি ত্যাগ করেন।[৮৬] জয়নুল আবেদিন সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৫ মার্চ হিলাল-ই-ইমতিয়াজ বর্জন করে বলেন, 'জনগণকে যেভাবে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তার প্রতিবাদে আমি হেলাল-ই-ইমতিয়াজ বর্জন করছি।' ১৬ মার্চ আবুল কালাম শামসুদ্দিন 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' এবং আহসান হাবীব ১৭ মার্চ 'সিতারা-ই-খিদমত' বর্জন করেন।[৮৭] এদের আগেই মুনীর চৌধুরী তাঁর খেতাব বর্জন করেন।[৮৮]

১৬ মার্চ বিকাল ৪টায় চারুকারু শিল্পীরা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে।[৮৯] বাংলা চারু ও কারুশিল্পী সংগ্রাম পরিষদের শহিদ মিনারের সভায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আবেগকম্পিত কণ্ঠে বক্তৃতায় বলেন,

> আমার সবুজ দেশ আজ লাল রঙের দেশ। অনেক রংই আমরা ছবিতে ব্যবহার করেছি। কিন্তু সবুজের দেশে এই লাল রঙের তুলনা নেই। বুকের রক্তের লাল রং যাঁরা রেখে গেছেন তাঁদের প্রাণের বাণীকে, তাঁদের সংগ্রামকে আমরা মুক্ত করব। শিল্পীর তুলি অত্যাচারীর বন্দুকের চেয়েও বেশি শক্তিশালী।[৯০]

তৎকালীন পরিস্থিতিতে শিল্পীদের যে ভূমিকা রয়েছে সে ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে জয়নুল আবেদিন বলেন,

> চিত্রকলার মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন সুন্দরভাবে হতে পারে। স্বাধিকার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে শিল্পীদের প্রস্তুত থাকতে হবে।... জনগণের মুক্তিসংগ্রামের সময় কেউ ঘরে সবে থাকতে পারেন না। বাংলাদেশের

> স্বাধিকার সংগ্রামে দেশের বীর জনতা বুকের রক্ত দিয়ে মুক্তির বীজ বপন করেছেন, এই অবস্থায় শিল্পীরা কেবল ঘরে বসে ছবি আঁকলে চলবে না। দেশের এই মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে শিল্পীদের একাত্ম হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলি, শিল্পীরা জনগণেরই লোক।[৯১]

১৬ মার্চ সভার পর জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে একটি মিছিলের সামনে চারজন ছাত্রী বুকে বহন করেন বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা 'স্ব-ধী-ন-তা'। মিছিলে প্রায় ৩৫টি কার্টুন, ফেস্টুন ও পোস্টার ছিল। কয়েকটি কার্টুন ও ফেস্টুনে লেখা ছিল–'হবুচন্দ্র ও গবুচন্দ্র' 'শোষণমুক্ত বাংলাদেশ কায়েম করো', 'আমার দেশের ফসল নিয়েছ তুমি, আমাকে দিয়েছ সমূহ সর্বনাশ, তোমার ওখানে মরুতে ফসল এল, শুধু অনাহারে কেটেছে আমার দিন', 'ডন কুইট জস্ট পগারপর, বিদ্রোহ চারিদিকে বিপ্লব আজ', 'একচেটিয়া পুঁজিবাদ খতম' প্রভৃতি। তবে ব্যঙ্গাত্মক একটি কার্টুন উল্লেখযোগ্য–খালি গায়ে বন্দুক হাতে এক পায়ে জুতো পরে পলায়নপর এক সৈনিক। তার দিকে বুট ছুড়ে মারা। লেখা ছিল, 'তোর জুতোটাও নিয়ে যা।'[৯২]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোতে প্রতিদিনই কোনো না কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে, সভা হয়েছে, মিছিল হয়েছে। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই রাজনীতি সচেতন সংস্কৃতি কর্মী ও শিল্পীরা অংশ নিয়েছে। তখন সবার মনে একটিই স্বপ্ন স্বাধীকার। মাতৃভূমিকে শোষণ বর্জন স্বৈরাচারী সরকারের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে। তাই অসহযোগ আন্দোলনের সময়কালে বাংলার সর্বস্তরের লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামকে বেগবান করতে রাজপথে নেমে আসেন। অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত শিল্পীদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিত। আর্ট কলেজের হোস্টেলের পাশেই ছিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর)-এর সদর দপ্তর। সেখান থেকে গোয়েন্দারা কলেজের হোস্টেলে আসা-যাওয়া করতেন। তারা কলেজের পিয়নদের কাছে জানতে চাইতেন, পোস্টারগুলো কে বা কারা আঁকে।[৯৩] ২৬ মার্চ ভোরে পিলখানা থেকে বেরিয়ে পাকিস্তানি সেনারা আর্ট কলেজের হোস্টেলে আক্রমণ চালায়। শিল্পীদের প্রতি ক্ষোভ থেকে শাসকগোষ্ঠী তাদের ওপর আক্রমণ করে।

২৫ মার্চ শিল্পীদের প্রতিরোধ

২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ৪১ নয়াপল্টনে *সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস* পত্রিকার অফিসে বসে কাজ করছিল শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। পত্রিকার সম্পাদের তাঁকে বাসায় ফিরে যাওয়া জন্য বলেন। তিনি অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে হেঁটে এগোতে লাগলেন। রাস্তাঘাটে স্বল্প আলো। শান্তিনগর মোড়ে গলির ধারে এসে আবছা আলো-আঁধারিতে দেখলেন ছেলেরা রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করছে। হঠাৎ কাইয়ুম চৌধুরীকে লক্ষ করে একজন বলে উঠলেন, 'তুমি এখানে কী করছ? এই মুহূর্তে বাসায় চলে যাও। শহরের অবস্থা খারাপ।' কাইয়ুম চৌধুরী বিস্মিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, আর কেউ নন, উচ্চকণ্ঠে কথা বলছেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কার মুখে তিনি ছেলেদের সঙ্গে সেই সন্ধ্যায় ব্যারিকেড তৈরি করছিলেন। শিল্পী কামরুল হাসানও সেই

রাতে হাতিরপুল এলাকায় স্থানীয় তরুণদের সঙ্গে মিলে হানাদার বাহিনীকে প্রতিহত করার কাজে নেমে পড়েছিলেন।[৯৪]

চিত্রশিল্প নিয়ে কথাশিল্পী সুবোধ ঘোষের একটি কথা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন–'ছবিতে রূপ ফুটিয়ে তোলাই শিল্পীর তুলি আসল কাজ নয়, সার্থক কাজও নয়। আসল কাজ হলো, রূপের আবেগ ফুটিয়ে তোলা।'[৯৫] আর সেই আবেগই হয়তো আবহমানকাল ধরে ফুটিয়ে তুলেছেন কিংবা তুলছেন সার্থক শিল্পীরা। কিন্তু বাংলাদেশের শিল্পীসমাজ শুধু চিত্র অঙ্কনের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেননি, বহু দুস্তর পথ পাড়ি দিয়ে একাত্তরের লড়াইয়ে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছিলেন। বস্তুত, চিত্রকলার ব্যাপারটাই ছিল পাকিস্তানি মতাদর্শের বিরুদ্ধে একটি সদাজাগ্রত চেতনা। সেজন্যই পাকিস্তানি চিন্তাধারার ধারকবাহকেরা সর্বদাই এর বিরোধিতা করেছে। এদেশে চারুকলা কলেজ প্রতিষ্ঠায়ও তারা নানাভাবে বাধা দিয়েছে। কিন্তু শেষাবধি তারা জয়ী হতে পারেনি। নানা বাধাবিপত্তিকে এড়িয়ে অবশেষে চারুকলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বাঙালির জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠা ও আত্মপরিচয় লাভের সংগ্রামে প্রতিষ্ঠানটি অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে।[৯৬]

উপসংহার

বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে এদেশের শিল্পীসমাজ গভীর অঙ্গীকার ও ঐকান্তিক দেশপ্রেমে নিজেদেরকে যুক্ত করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পর এই রাষ্ট্রের গণবিরোধী প্রতারক চরিত্র এদেশবাসীর কাছে উন্মোচিত হয়ে যায়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বিতর্কিত বক্তব্য খুব সহজেই পাকিস্তানি ভাবাদর্শের প্রকৃত স্বরূপটিকে চিনিয়ে দেয়। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বৈরাচারী ঘোষণা একটি সত্যকে উন্মোচিত করে, আর তা হলো, পাকিস্তান বাঙালিদের জন্য আসেনি। পাকিস্তানি রাষ্ট্রশক্তি যে বাঙালি জাতিসত্তার শত্রুপক্ষ, সেই সত্যটি সমাজের অন্যান্য অংশের মতো শিল্পীসমাজও গভীরভাবে উপলব্ধি করে। ধীরে ধীরে সমাজের সর্বস্তরে এই উপলব্ধি গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়ে।[৯৭]

ভাষার ওপর আঘাতে মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বাঙালির ওপর যে আগ্রাসন শুরু হয় তা প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালির প্রতিরোধ করে। এই প্রতিরোধে শিল্পীগণও যুক্ত হয়। এই প্রক্রিয়া তাঁরা করে দুইভাবে। এক. তাদের শিল্পকর্মের মাধ্যমে এবং দুই. সরাসরি রাজনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। ভাষা আন্দোলনের পর থেকে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক কার্যক্রমে শিল্পীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। নববর্ষ তথা পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ওইদিন সকালে চারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে যে-বর্ণময় শোভাযাত্রা বের হয় তাতে শিল্পীদের ভূমিকাই থাকত প্রধান। শুধু শোভাযাত্রা নয়, একুশে ফেব্রুয়ারির দেওয়াল-লিখন থেকে শহিদ মিনার চত্বর আলপনায় ভরিয়ে তোলার উদ্যোগেও শিল্পীগণের ভূমিকা ছিল অগ্রণী।[৯৮] প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের মোকাবিলা করতে হয়েছে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু। এর মাধ্যমে তার সরাসরি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে এবং নিজেদেরকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত রাখতে সক্ষম হন।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার অঙ্গীকার এভাবেই শিল্পীকে সক্রিয় করে তোলে মহত্তর জাতীয় সংগ্রামে, অনাগত সম্ভাবনার রক্তাক্ত পথযাত্রায়।

শিল্পীসমাজ শুধু তাদের শিল্পকর্মের মধ্যে বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে এনেই ক্ষান্ত হননি; বরং তাঁরা রাস্তায় নেমে অসহযোগ আন্দোলনের সময় ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করছেন–এই দৃশ্য দুটি আমাদের মুক্তিসংগ্রামের অনন্য চিত্রপট হয়ে চির জাগরূক থাকবে। শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে শিল্পীদের প্রতি যে ক্ষোভ তার প্রমাণ পাওয়া যায় পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে মুক্তিযুদ্ধের আর্ট কলেজের ছাত্র–শাহনেওয়াজ হত্যার মাধ্যমে।[৯৯]

তথ্যসূত্র

১ সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি*, 'জয়নুল আবেদিন', নিসার আলী, (ঢাকা: বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ২০১৬), ২০৮।

২ আবুল মনসুর, *শিল্পকথা শিল্পীকথা*, (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০১৬), ৯৭। পঞ্চাশের দশকের অধিকাংশ শিল্পীর মধ্যে লৌকিক বা দেশজ উপাদান কমই দেখতে পাওয়া যায়।

৩ *পথরেখা*, 'প্রসঙ্গ : চিত্রকলা ও স্থাপত্য', (ঢাকা: ১৪১৯ বঙ্গাব্দ), সম্পাদকের কথা।

৪ শরীফ আতিক-উজ-জামান, *শিল্প ও শিল্পী*, (ঢাকা : ধ্রুবপদ, ২০১৬), ৩৯।

৫ আহম্মেদ শরীফ, "বাঙালিত্বের বিকাশ ও রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া : বিশশতকের ষাটের দশক", অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ইতিহাস বিভাগ, ২০২০), ২৬১।

৬ *প্রাগুক্ত*।

৭ নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, (ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০১৫), ৩৩।

৮ *প্রাগুক্ত*, ৭৫।

৯ শরীফ আতিক-উজ-জামান, *প্রাগুক্ত*, ৫৭।

১০ আবুল হাসনাত (সম্পা.), *অনন্য আমিনুল ইসলাম*, (ঢাকা: বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০১২), ৫২-৫৩।

১১ রওশন আর আমিন, তাহেরা বেগম, জোবেদা খানম, মঈনা ও মিনু (হাসিনা)।

১২ হাশেম খান, *শিল্পীর স্কেচ খাতা*, 'মিসবাহউদ্দিন খান স্মারক বক্তৃতা- ১২', (ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা, ২০১৯), ৪১।

১৩ *প্রাগুক্ত*, ৪০-৪১।

১৪ বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা, 'শিল্পী এস. এম. সুলতান : বাঙালিত্বের চেতনাধারী চিত্র লেখক', আইবিএস জার্নাল, অষ্টাদশ সংখ্যা, (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ ২০১১), ১৪৬।

১৫ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *জয়নুল আবেদিনের জিজ্ঞাসা*, (ঢাকা: জার্নিম্যান বুকস্, ২০১৬), ৬০।

১৬ কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১০), ৩৬-৩৭।

১৭ *প্রাগুক্ত*, ৩৭।

১৮ *পথরেখা*, ১৯।

১৯ *প্রাগুক্ত*, ২৬৩।

পাকিস্তানের আধা-উপনিবেশবাদী শাসক-শোষকশক্তির কাছে জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসানের অবস্থান অবশ্য দুর্বল ছিল না। পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান শিল্পী হিসেবে তিনি রাষ্ট্রের অধিপতিদের কাছে বিশেষভাবে আদৃত ছিলেন। তাদের বারবার কাছে টেনেছে। তারা সেসব আহ্বানে সাড়াও দিয়েছেন। কিন্তু কখনও কেন্দ্রের মানসিকতা দ্বারা আচ্ছন্ন হননি। কেন্দ্রে অবস্থান করে কখনো স্বস্তিও পাননি। জয়নুল আবেদিনের মনোযোগ ও দৃষ্টি সবসময়ই কেন্দ্রীভূত ছিল পূর্ববাংলার প্রতি। বাঙালির শিল্পশিক্ষার পথ প্রশস্ত করার জন্য তিনি ঢাকায় চারুকলা শিক্ষালয় গড়ে তোলেন। সারা পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান শিল্পশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে একে উন্নীত করার জন্যে তিনি নিরলসভাবে চেষ্টা করে গেছেন।

২০ সৈয়দ জাহাঙ্গীর, *আত্মপ্রতিকৃতি স্মৃতির মানচিত্র*, (ঢাকা: বেঙ্গল পাবালিকেশন্স লিমিটেড, ২০১৫), ৩৭।

২১ নজরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, ২৩।

২২ বীরেন সোম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে শিল্পীসমাজ*, (ঢাকা: চন্দ্রাবতী একাডেমি, ২০১৫), ৪৫।

২৩ নজরুল ইসলাম, 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন', *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, ৫৮ বর্ষ : ৩য়-৪র্থ সংখ্যা॥ জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, মে ২০১৭, ১৮।

২৪ নজরুল ইসলাম, ২২-২৩।

২৫ 'সম্ভবত বিজন চৌধুরীর আঁকা ছিল ওই ব্যানারটি।'

২৬ *পথরেখা*, *প্রাগুক্ত*, ২১১-২১২।

২৭ মুর্তজা বশীর, *আমার জীবন ও অন্যান্য*, (ঢাকা: বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০১৪), ৮৬।

২৮ *প্রাগুক্ত*।

২৯ *পথরেখা*, ২৬৩-২৬৪।

৩০ আহম্মেদ শরীফ, *বাংলাদেশ নির্বাচন ও গণতন্ত্র*, (ঢাকা: অন্যন্যা, ২০১৫), ১; নজরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, ২৩।

৩১ কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১০), ৪২।

৩২ *প্রাগুক্ত*, ৪৩।

৩৩ *প্রাগুক্ত*।

৩৪ (১৯৫১-১৯৬১ সাল পর্যন্ত)

৩৫ 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন' শিরোনামে পোস্টারের রূপকার ছিলেন নূরুল ইসলাম।

৩৬ হাশেম খান, 'ছয় দফা সংবিধান এবং একটি পোস্টার', লুৎফর রহমান রিটন (সম্পা.), *নেপথ্য কাহিনী*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০১), ৩৮।

৩৭ এ পর্যায়ে আওয়ামী লীগের প্রচার বিভাগের নূরুল ইসলাম শিল্পী হাশেম খানকে ছয়দফার ঘোষণাপত্রের একটি নকশা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান।
শিল্পী হাশেম খান এ প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করে বলেন, '১৯৬৬ সালের এক সন্ধ্যায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন তিনি (নূরুল ইসলাম) আমার ঠিকানায়–২৫ গোপীবাগ ৩য় গলির বাড়িতে। বললেন, আওয়ামী লীগের ৬ দফার লোগো, পতাকা, প্রচার পুস্তিকা, প্রচ্ছদ ও পোস্টার ইত্যাদি করতে হবে।'

৩৮ *প্রাগুক্ত*।

৩৯ বীরেন সোম, *প্রাগুক্ত*, ৪৬।

৪০ *প্রাগুক্ত*, ৪৭।
৪১ বৈশাখী মেলা অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন শিল্পী কামরুল হাসান।
৪২ সৈয়দ আজিজুল হক, *কামরুল হাসান : জীবন ও কর্ম*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), ৯১।
৪৩ পত্রিকাটির নাম ছিল *ফোরাম* এবং তা ইংরেজিতে প্রকাশিত হতো।
৪৪ রফিকুন নবী, *স্মৃতির পথরেখায়*, (ঢাকা: বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ২০১৯), ৯৬-৯৭।
৪৫ সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি*, 'জয়নুল আবেদিনের স্মৃতি', আনিসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, ৬৭।
৪৬ *প্রাগুক্ত*।
৪৭ বীরেন সোম, *প্রাগুক্ত*, ৪৫।
৪৮ *প্রাগুক্ত*, ৪৭।
৪৯ *প্রাগুক্ত*, ৪৭-৪৯।
৫০ *প্রাগুক্ত*, ১৬।
৫১ *পথরেখা*, ১৯।
৫২ বীরেন সোম, *প্রাগুক্ত*, ১৭।
৫৩ নজরুল ইসলাম, 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন', *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, *প্রাগুক্ত*, ১৯।
৫৪ কামরুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, ৪৩।
৫৫ *প্রাগুক্ত*।
৫৬ এই মিছিলের ধারণা দিয়েছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন।
৫৭ বীরেন সোম, *প্রাগুক্ত*, ৪৫।
৫৮ *পথরেখা*, *প্রাগুক্ত*, ২৩৮-২৩৯।
৫৯ *প্রাগুক্ত*, ১৯।
৬০ *প্রাগুক্ত*, ২০।
৬১ *প্রাগুক্ত*, ২১২।
৬২ *প্রাগুক্ত*, ২৩৯।
৬৩ গাজী তানজিয়া, *প্রাগুক্ত*, ২১২।
৬৪ কামরুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, ৩৭।
৬৫ *প্রাগুক্ত*, ৩৮।
৬৬ *প্রাগুক্ত*, ৩৭।
৬৭ কামরুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, ৩৯।
৬৮ হাশেম খান, *প্রাগুক্ত*, ৩৯।
৬৯ রফিকুন নবী, *স্মৃতির পথরেখায়*, *প্রাগুক্ত*, ৯৭।
৭০ *প্রাগুক্ত*।
৭১ *প্রাগুক্ত*।
৭২ রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, (ঢাকা: একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০০২), ৭১।
৭৩ মুর্তজা বশীর, *প্রাগুক্ত*, ৭৮।
৭৪ *প্রাগুক্ত*, ৫৬।
৭৫ *প্রাগুক্ত*।
৭৬ *প্রাগুক্ত*, ৫৭।

৭৭ *প্রাগুক্ত*।
৭৮ *প্রাগুক্ত*, ৪১৪।
৭৯ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ মার্চ ১৯৭১।
৮০ *সংবাদ*, ১২ মার্চ ১৯৭১।
৮১ *আজাদ*, ১৩ মার্চ ১৯৭১; *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৩ মার্চ ১৯৭১।
৮২ 'প্রতীক' অর্থ 'শাপলা' ফুলকে বোঝানো হয়েছে।
৮৩ মুর্তজা বশীর, *প্রাগুক্ত*, ৫৭।
৮৪ *প্রাগুক্ত*, ৫৮।
৮৫ *প্রাগুক্ত*, ৫৯।
৮৬ *সংবাদ*, ১৬ মার্চ ১৯৭১; *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৫ মার্চ ১৯৭১; *আজাদ*, ১৫ মার্চ ১৯৭১।
৮৭ মুর্তজা বশীর, *প্রাগুক্ত*, ৫৭।
৮৮ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ মার্চ ১৯৭১।
৮৯ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ মার্চ ১৯৭১।
৯০ *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৭ মার্চ ১৯৭১; মুর্তজা বশীর, *প্রাগুক্ত*, ৫৮।
৯১ মুর্তজা বশীর, *প্রাগুক্ত*, ৫৮-৫৯।
৯২ *প্রাগুক্ত*।
৯৩ বীরেন সোম, *প্রাগুক্ত*, ৫০।
৯৪ *প্রাগুক্ত*, ৫১।
৯৫ *পথরেখা*, *প্রাগুক্ত*, ২৩৯।
৯৬ বীরেন সোম, *প্রাগুক্ত*, ৪৫।
শিল্পীদের আন্দোলনে যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের মধ্যে ছিলেন–ইমদাদ হোসেন, হাশেম খান, গোলাম সারোয়ার, আনোয়ার হোসেন, হাসান আহমেদ, প্রফুল্ল রায়, নাসির বিশ্বাস, শাহাদাত চৌধুরী, মঞ্জুরুল হাই, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ, আবুল বারক্ আলভী, বিজয় সেন, রেজাউল করিম, এসএম খালেদ, মাহতাব, মতলুব আলী, লুৎফুল হক এবং আরও অসংখ্য ছাত্রছাত্রী। শাহাদাত চৌধুরী আন্দোলনের পরিকল্পনা ও পরামর্শ দানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।
৯৭ *প্রাগুক্ত*, ৪৩।
৯৮ আবুল হাসনাত (সম্পা.), ৫৪-৫৫।
৯৯ রফিক হোসেন, *প্রাগুক্ত*, ৫৫।